দরকার একজন জীবনকর্মা, সূর্যের জন্য চাই সূর্যকার (সূর্যের কারিগর), চন্দ্রের জন্য একজন চন্দ্রকর্মা, আর বৃষ্টির জন্য চাই একজন বৃষ্টিকার ইত্যাদি। কিন্তু ঘড়ির জন্য ঘড়ির কারিগরের উপমা নিয়ে শুরু করলেও বিশ্বাসীরা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি বস্তুর জন্য যুক্তিহীনভাবে মাত্র একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করে থাকেন। এছাড়া আমাদের মহাবিশ্ব ছাড়াও যদি একাধিক মহাবিশ্ব থেকে থাকে, তাহলে একাধিক ঈশ্বর থাকতেই বা বাধা কোথায়?

৩. শূন্য হতে ঘড়ি ঃ সাঁইবাবার ম্যাজিক?

ঘড়ি বা নৌকা বানানোর জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা কিন্তু প্রকৃতিতে বিদ্যমান। নৌকার ক্ষেত্রে কাঠ পাওয়া যায় গাছ কেটে। ঘড়ির ভেতরের কলকব্জাগুলো বানানো হয় লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু থেকে। কিন্তু বলা হয়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন একদম শূন্য হতে (ex Nihilo)। সুতরাং ঘড়ির কারিগরের সাথে মহাবিশ্বের কারিগরের মিল খোঁজার চেষ্টাটি ভুল।

৪. ভুল সাদৃশ্য

ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্যটি আরেকটি কারণে ভুল তা হলো, এখানে অবচেতন মনে ভেবে নেয়া হচ্ছে যে, যেহেতু দ'টি বিষয়ে (ঘড়ি তৈরি ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি) একটি 'অভিন্ন বৈশিষ্ট্য' রয়েছে, অতএব, তাদের মধ্যে তৃতীয় একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক নিচের উদাহরণটি—

ক। ঘড়ির গঠন জটিল।

খ। ঘড়ির জন্য একজন কারিগর দরকার।

গ। মহাবিশ্বের গঠনও জটিল।

ঘ। সুতরাং মহাবিশ্বের জন্য একজন কারিগর আবশ্যক।

শেষ পদক্ষেপটি ভুল। কারণ, এটি এমন একটি উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে যা বিচারের নীতি বা নির্ণায়ক দ্বারা সমর্থিত নয়। উপরের যুক্তির ভুলটি নিচের আরেকটি উদাহরণের সাহায্যে আরো ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায়—

ক। পাতার গঠন জটিল।

খ। পাতা গাছে জন্মে।

গ। টাকার হিসাবের (Money bills) গঠনও জটিল।

ঘ। সুতরাং টাকা গাছে জন্মায় (এটি প্রবাদে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে ঘটে না!)।

৫. অসঙ্গতি

পিলের যুক্তি পদ্ধতিতে ধরে নেয়া হয়েছে ঘড়ির গঠন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত পাথর, খনিজ বা পাহাড়-পর্বতের মতো সহজ সরল ও বিশৃঙ্খল নয়। তাই তার কারিগর লাগবে। আবার একই সাথে মহাবিশ্বের গঠন ধরে নেয়া হয়েছে জটিল এবং সুশৃঙ্খল ('সহজ সরল' প্রকৃতি এর একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও)। তাই এটি একটি অসম তুলনা।

৬. চক্রাকার যুক্তি

'কে বানালো এমন নিখুঁত মহাবিশ্ব?' অথবা, 'বলুন তো, আমাদের তৈরি করেছে কে?' (Who created us?) - প্রায়শই এ প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয় যুক্তিবাদীদের। কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তারা বোঝেন না যে, এ ধরনের প্রশ্ন বিজ্ঞানের চোখে অর্থহীন প্রশ্ন। সঠিক প্রশ্নটি হবে 'এই সৃষ্টির রহস্যের প্রক্রিয়াটি কি?' বা 'আমাদের জীবন গঠনের মূলনীতি বা পদ্ধতিটি কি?' এবং বিজ্ঞান সর্বদাই এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর বা ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। বিজ্ঞান আজ পরিষ্কারভাবেই জানে যে মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোনও 'ঈশ্বর' নামক কোনও 'বড় বাবু' নন, বরং পদার্থবিজ্ঞানের কিছু নিয়মাবলী (Laws of Physics)। আসলে এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই ঘটছে। কাজেই, আমাদের এ পর্যন্ত পাওয়া জ্ঞান থেকে বলা যায় 'ঈশ্বর' বলে কাউকে অভিহিত করতে চাইলে তা করা উচিত আসলে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণহীন নিয়মগুলোকে।

'কে আমাদের বানিয়েছে'— বিশ্বাসীদের তরফ থেকে করা এ ধরনের প্রশ্ন আরেকটি কারণে অর্থহীন তা হলো, এখানে প্রচ্ছন্নভাবে উত্তরটি আগে থেকেই অনুমান করে নেয়া হয়েছে— 'কে আবার বানাবে- ঈশ্বর!'। অর্থাৎ 'ঈশ্বর আছে' এটা ধরে নিয়েই এ ধরনের প্রশ্ন করে উত্তর খোঁজার চতুর চেষ্টা এক ধরনের চক্রাকার পথে ভ্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়। মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব জামান তার 'Who Created you? প্রবন্ধে ব্যাপারটি খুব পরিষ্কারভাবেই ব্যাখ্যা করেছেনঃ [৬]

'আপনকে কে সৃষ্টি করেছে' এ ধরনের প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না, কারণ প্রথমত প্রশ্নটির মধ্যেই এর উত্তর ধরে নেয়া হয়েছে- যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। এবং যদি সৃষ্টিকর্তা থেকে থাকেন তাহলে প্রশ্নটির উত্তর এক ধরনের পুনরুক্তি (tautology) ছাড়া আর কিছু নয়; সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সৃষ্টি করেছে। সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে প্রশ্নকারী সৃষ্টিকর্তার নাম জানার জন্য প্রশ্নটি করেননি। সুতরাং এটি একটি অর্থহীন প্রশ্ন। আমি যে বলেছি যথার্থ প্রশ্ন হলো জীবন সৃষ্টির কারণ কী (কে নয়), যদি কোনও কারণ থেকে থাকে। এবং উত্তর হলো যা আমি উপরে দিয়েছি (যার সাথে অধিকাংশ নামকরা পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানীরা একমত)।

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রাকৃতিক বিভিন্ন 'দৈব' ঘটনার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে নানা ধরনের 'অতিপ্রাকৃতিক সত্তার' কল্পনা করে নিয়েছে মানুষ। বনে হঠাৎ দাবানলে সমস্ত কিছু যখন পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তখন ভয় পেয়ে মানুষ এর পেছনে 'অগ্নি' নামক দেবতার কল্পনা করে নিয়েছে।[৭] পুজো-অর্চনা করে সেই দেবতাকে তুষ্ট করতে চেয়েছে বারেবারেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশায়। বৃষ্টি কেন হয় এ ব্যাপারটিও এক সময় মানুষের জানা ছিল না। তাই ঝড়-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসলাম ধর্মে যেমনি 'মিকাইল ফেরেস্তার' কল্পনা করা হয়েছে হিন্দুশাস্ত্রে করা হয়েছে 'দেবরাজ ইন্দ্র' এবং 'বরুণের' কল্পনা। কিন্তু আজ স্কুলের ছোট ছেলেটিও জানে যে বৃষ্টি হয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে জলচক্র (Water Cycle) অনুসরণ করে। কীভাবে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, কীভাবে তা মেঘে পরিণত হয়, আর কীভাবে তা আবার বারিধারায় রূপান্তরিত হয়ে ধরা পৃষ্ঠে ফিরে আসে তা আজ প্রাইমারি স্কুলের বইগুলোতেই পাওয়া যায়। এই পৃথিবী কীভাবে শূন্যে ঝুলে থাকে তা একসময় মানুষের জানা ছিল না, রহস্য সমাধান করতে গিয়ে আমরা ধরিত্রী মাতাকে বসিয়েছি কখনও অদৃশ্য গরুর শিং-এর উপর অথবা দৈত্যাকার কোনও কচ্ছপের পিঠে কিংবা মহাসর্প বাসুকীর ফণার উপর। কিন্তু আজকের মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়া ছাত্ররাও নিউটনের মহাকর্ষ ও বলবিদ্যার নিয়ম ব্যবহার করে ভালভাবেই শূন্যপথে গ্রহ-উপগ্রহাদির পরিভ্রমণের ব্যাখ্যা দিতে পারে। মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে মানুষ এক সময় কল্পনা করেছে 'অদৃশ্য ও অমর আত্মার' এবং যমদূত বা আজরাইলের মতো কাল্পনিক চরিত্রের। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আজরাইলের প্রাণহরণের গালগল্প বা আত্মার অমরত্ব ছাড়াই প্রকৃতি জগতের নিয়ম-কানুন দিয়ে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে পারছে। এ বিষয়ে আমার লেখা ও মুক্তমনা ওয়েবসাইটে

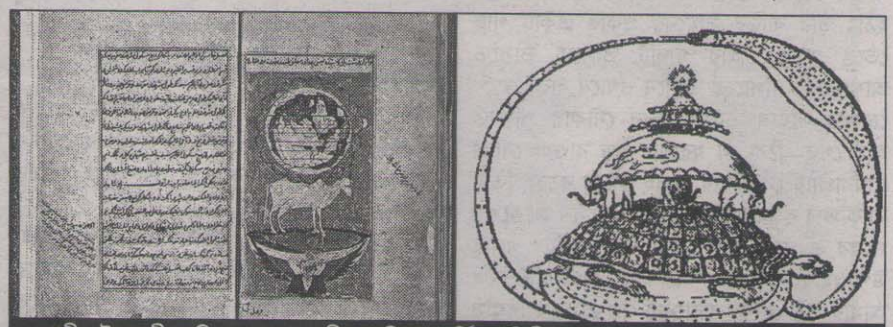

প্রাচীন ইসলামী সাহিত্য এবং ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত পৃথিবীর স্বরূপঃ (ক) গরুর শিং এর উপর, (খ) সাপ, কচ্ছপ, আর হাতীর উপর পর্যায়ক্রমে স্থাপিত